আর্বান সবুজায়ন সাহিত্য সমিতির

ই-পত্রিকা (দ্বিতীয় সংখ্যা)

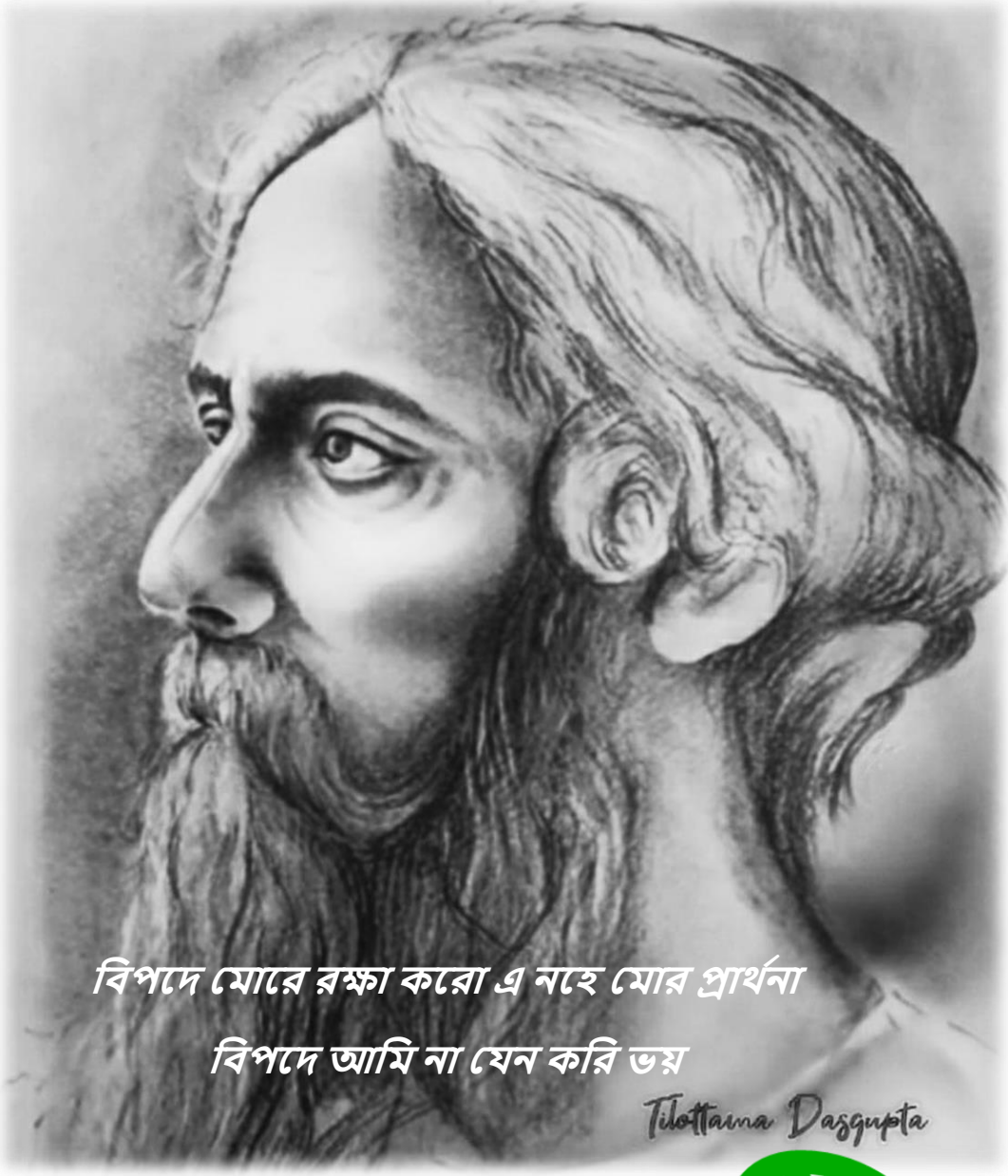

সবুজ সৃষ্টি

সাহিত্য-সংকলন

২২ শে মে, ২০২১

সম্পাদকীয়

আর্বান সবুজায়ন সাহিত্য সমিতির পক্ষ থেকে আমরা যে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করি, তার দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে ঠিক যেন কলম সরছে না। চারদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। আমাদের আবাসনের একটা বড় অংশ আজ করোনা নামক অতিমারীর করাল গ্রাসে সংক্রমিত। আমাদের অনেকেই আজ প্রিয়জন হারানোর শোকে মুহ্যমান। এই ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমরা সমিতির সকল সদস্য একজোট হয়ে প্রার্থনা করি যেন খুব শীঘ্রই আমরা এই মারণ রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত হতে পারি। আর আমাদের এই চলার পথে পথপ্রদর্শক হয়ে দেখা দিন রবিঠাকুর। কবির কবিতা হয়ে উঠুক আমাদের চেতনা, কবির গান হয়ে উঠুক আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। কবির জীবনকে পাথেয় করেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই এক অনিন্দ্যসুন্দর ভবিষ্যতের দিকে। অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও কবি যেভাবে ওনার মানবিক চেতনাশক্তিকে লুপ্ত হতে দেননি, ঠিক সেভাবে আমরাও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও মানবিক দূরত্ব ঘুচিয়ে চলে এসেছি পরস্পরের কাছাকাছি।

কবি পক্ষে কবির বাণী ও জীবনকে স্মরণ করেই আমাদের সাহিত্য সমিতির পত্রিকা সবুজ সৃষ্টির দ্বিতীয় সংখ্যা কবিগুরুর চরণে নিবেদন করলাম। আমাদের এই কবি প্রণাম সংখ্যা কেমন লাগল, তা জানার অপেক্ষায় রইলাম।

আর্বান সবুজায়ন, কোলকাতা
২২ শে মে, ২০২১

অর্ণব কুমার দে

মতামত জানান: ইমেল- ussahityasamiti@gmail.com

ফোন: 9051250134/ 9836477350

পত্রিকার পাতায় পাতায়
ভরেছে যাদের লেখায়...

কিছু কবিতার পাতা		
কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
আমার কবি	সুতপা মণ্ডল	5
পদধ্বনি	বিজয়া মজুমদার	8
কবিতার দু:সময়	তুষার চক্রবর্তী	9
এ মন	মঞ্জু বোস	10
সবুজের ডাক	অরিন্দম নন্দী	12
ভোরের আলোয়	সুজিত ঘোষ	14
কবি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?	এষা দে মজুমদার	17
বিষন্নতা	নির্মল সি সাহা	19
বক্ত গুজার লে সংগ সংগ	অমিতেশ	20
চির সবুজ মন	মঞ্জু বোস	21
বৈষম্য	নির্মল সি সাহা	23
আশাএঁ	দেবরীনা পাত্রা	24
পরিত্রাণ	নির্মল সি সাহা	27
ইচ্ছাশক্তি	মঞ্জু বোস	29
রাত্রি যতই গভীর হোক	তুষার চক্রবর্তী	30
আলো না অভিশাপ	অঙ্কুর মন্ডল	31
আম কা সফর	নংদিনী সেন	33
আমি একা	অতনু চট্টোপাধ্যায়	35
যদি	রিমঝিম	36
Envy	Nandini Sen	37
গলে মোম জ্বলি আমি	রিমঝিম	39
বৃত্ত	নীলাঞ্জনা জি বসু	40
প্রশ্ন	রিমঝিম	41
কিছু গল্পের পাতা		
গল্প	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
অনুরাগী	নির্মল সি সাহা	43
পারকর পেন	অমিতেশ রংজন	50
প্রথম বর্ষাতি	পায়েল চক্রবর্তী	54

যুগ্ম-সম্পাদক: অতনু চট্টোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু

প্রচ্ছদ: তিলোত্তমা দাসগুপ্ত

সহযোগিতায়: তুষার চক্রবর্তী এবং অরিন্দম নন্দী

আমার রবি

সুতপা মন্ডল

কাল ছিল ডাল খালি

আজ ফুলে যায় ভরি,

বল দেখি তুই মালি

হয় তা কেমন করে?

কিছু না বুঝেই সুর করে পড়তাম

স্কুলের সকলে মিলে,

সেই শুরু তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের।

তারও আগে ছবি ছড়ার বইতে তোমার ছবি দেখে বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম বাবা এ কে গো?

বাবা বলেছিলো ইনি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এনাকে প্রনাম কর,

আমি মাথাটা ঠেকিয়ে ছিলাম ছবিতে

ভেবেছিলাম আর পাঁচটা ঠাকুরের মত তুমিও আর এক ঠাকুর।

বিশ্ব কি আর কবিই বা কি তাই জানতাম না।

তারপর গড়িয়ে চলল দিন মাস বছর,

আমিও তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম, আমার কাছে তখন গান মানেই রবীন্দ্রনাথ,

নাচ মানেই রবীন্দ্রনাথ,

প্রবন্ধ গল্প নাটক আরো কত কি যে তা বোধহয় আজও জানিনা,

স্কুলের পঁচিশে বৈশাখে গান গেয়েছি নেচেছি, নাটক করেছি

সবই তোমাকে ঘিরে,

ধীরে ধীরে তুমি ছড়িয়ে পড়লে আমার সত্ত্বায় আমার চিন্তায় আমার মননে আমার অন্তরে।

তারপর একদিন ঠিকানা বদল হল

কিন্ত বদল হল না তোমাকে ধরে আমার সময় বয়ে যাওয়ার।

তার ও পরে সংসারের নানান ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হতে হতে

আমি যেন প্রাণহীন হতে থাকলাম,

একটা সময় মনে হল তোমার সঙ্গে আমার বোধহয় দূরত্ব বাড়ছে, আর তো তেমন করে পাইনা তেমন করে,

সময়ের বড্ড অভাব, দিন রাতের হিসেবে যায় গুলিয়ে,

মনে হয় আমার কেউ নেই, আমি কারোও নয়,

কিন্ত ভুল ছিলাম আমি

আমার কাছেই তো ছিলে শিশুর বেশে,

তোমায় দেখতে কেন পাই নি?

এক মন খারাপের দিনে বসেছিলাম একা একধারে, হঠাৎ শুনি বাজছে কোথাও "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পুণ্য কর...

পেছন ফিরে দেখি আমার তিন বছরের ছোট্ট ছেলেটা কোনরকমে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে নিয়ে আসছে রেডিও টা,

তাতেই বেজে চলেছে গান টা,

বিস্ময়ে অভিভূত আমি,

এতটুকু ছোট প্রাণ সে কি করে বুঝলো যে এখন মায়ের রবি ঠাকুর দরকার,

আধো আধো মুখে বলছে মা লবি ঠাকুর "।

বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রু এখন আমার চোখে

এই তো আমার তুমি আছো, এই তো আমার সবই আছে, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম ছেলেকে,

আর দুলে দুলে গাইলাম আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর

নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে...

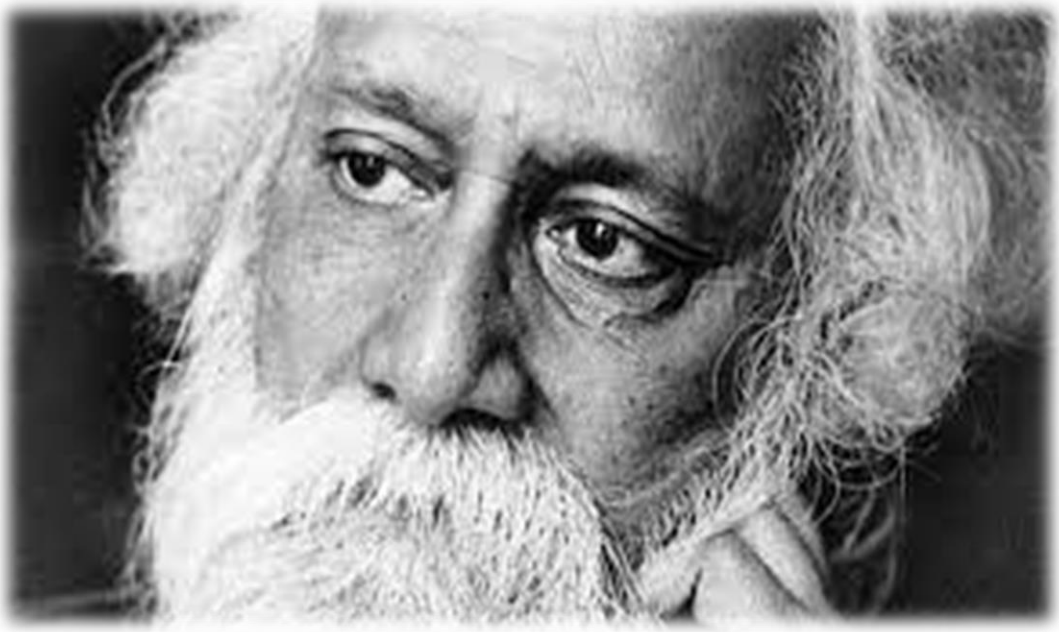

পদধ্বনি

বিজয়া মজুমদার

কে যেন আসে, ধীরে ধীরে,
পদধ্বনি শুনি, ধীরে ধীরে, কে যেন আসে।
দূর দিগন্ত হতে, কাছে, আরো কাছে।
আমারে জানাতে আমন্ত্রণ|
অনাহুত, রবাহুত সে-জন,
লাঞ্ছিত হয় বারংবার|
তবু সে আসে-- ব্যথা-বেদনায় ভরা দুটি চোখ
প্লাবিত অশ্রু জলে|
নীরবে জানায় আমন্ত্রণ
একি সুকঠিন বেড়াজালে বাধা
দুস্তর সামাজিক শৃঙ্খল|
প্রেম দ্বিধাহীন, নির্লিপ্ত, তবু,
আছে তার অন্তরে আসন পাতা|
নিয়তির দুর্বার টেনে নেয় নিজ বক্ষে|
তবু সে আসে, ধীরে, অতি ধীরে|
নিঃশব্দে সমর্পণের আর্তিতে|
দূর দিগন্ত হতে কাছে, আরো কাছে|
কথা কয় কানে কানে,
হৃদয়ের মাঝখানে|
'ওগো', তুমি যে আমার|
একান্ত আপন|
ভুলোনা আমায়, এ মিনতি রাখো|

কবিতার দুঃসময়

তুষার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের বাংলায় আজ ক্রন্দনধ্বনি,
সস্তায় বিক্রি হ'তে রাজী সব বিদ্বজন-ই,
কোথায় নজরুল, প্রেমেন মিত্ররা কোথায়,
সজনি রজনী দ্বিজেন, অন্নদাশংকর রায়?
মধুহীন কোকনদ, সুকান্তর 'আর কাব্য নয়',
বাংলার সংস্কৃতি আজ চুরি হয়ে যাবার ভয়,
নীরেনের সেই অমর কবিতা, "উলঙ্গ রাজা" ,
কবি আজ বিদূষক,ভেঙ্গে গেছে তার মাজা,
বিদ্বজন সব শিরদাঁড়াহীন, মস্তকও অবনত,
চাদরের লোভে পিছন মোছে সুবোধের মতো,
কোথায় সুভাষ, কোথায় সুনীল, নেই শক্তি,
শাষকের পদপ্রান্তে বসে, নির্ভেজাল ভক্তি,
শেষ আশা ছিল, শুনতে পেতাম শঙ্খনাদ,
প্রতিবাদের কবি, সত্য ছিল যার জলভাত,
চলে গেলেন শঙ্খ ঘোষ, সকলেরই প্রিয়,
কবির স্মৃতিবেদীতে, রক্তিম গোলাপ দিও।

এ মন

মঞ্জু বোস

বরফে ঢাকা পর্বতমালা
তারই কোলে কোলে
মেঘের খেলা
দেখতে এ মন টানে,
ছুটে বার বার
তাইতো আমায়
শৈল শহরে আনে।
ভোরের আলোয়
তুষার শৃঙ্গ কাঞ্চন রূপ ধরে,
সায়াহ্নে মেঘ
সেই রঙ ধার করে।

হিমবাহ গ'লে ঝর্ণা হয়ে
জলাশয়ে আছড়ে পড়ে।
দেখেছো কখনো আগে,
ঝর্ণার গায়ে রামধনু জেগে
বিচিত্র রূপ গড়ে?

সেই অপরূপ দৃশ্য শোভা
আমার এ মন কাড়ে।

পাহাড় সাজে রকমারি ফুলে
সে দৃশ্য দেখে মন ওঠে দুলে,
গন্ধ না থাক,আছে যে তার
বিচিত্র সব রঙের বাহার।

প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ,
টানে যে এ শুধু বার বার।

সবুজের_ডাক

অরিন্দম নন্দী

সবুজ মোদের আঁকড়ে বুকে
দিচ্ছে জোগান অক্সিজেনের,
নতুন চারায় জল দিয়ে যান
চিন্তা ফুরোক সিলিন্ডারের !

বাঁচলে ওরা বাঁচবে তুমি
বাঁচবে সারা বিশ্বজন,
নইলে পরে সামলাবে না
জীবন বায়ু লক্ষ টন !

ডাকলে পরে হাঁকটা দিও
চুপ থেকোনা প্রাণভয়ে,
তোমার ঘরের দরকারেতে
নইলে তারাও সংশয়ে !

গরীব ঘরের উনুন গুলোও
তাকিয়ে আছে চুপেচাপে
সবাই মিলে ভাগ করে নিই
দায়িত্বটা, সুখতাপে !

আবার সময় একটু থামার
ফিরে দেখার, দিনগুলি
ব্যস্ত খাতায় ত্রস্ত জীবন
সূর্য এখন ঘুলঘুলি !

হাতে হাত রেখে উৎরে যাবো
একটু সবুর ঘরটাতে,
নিয়ম বিধি জীবন-মুখোশ
মানুন সবাই একসাথে !!

ভোরের আলোয়

সুজিত ঘোষ

ভোরের আলোয়- পাখির ডাকে
বারান্দায় একা ------
ভালোই লাগে কোকিল এর
কুহু ডাক ---
আর চলন্ত মানুষের দেখা ।

বৈশাখের দাব দাহ- রোদ্দুর
ভরা দুপুর -----
আর কিছুদিন পর
বর্ষার আগমনে- জলে ভরে'
যাবে গ্রামের সব পুকুর ।
সঙ্গে এক কাপ কফি -আর
কাগজ কলম-----
দিনগুলো কাটছে যে মোদের ভয়ে
সারা পৃথিবীতে আজ
করোনার সংক্রমণ।
অক্সিজেন নেই,হাসপাতালে
বেড নেই ,

নেই ওষুধ এবং ডাক্তার ---
আমরা কি কখনও ভেবেছিলাম
এই ভাবে এ জীবন কাটবে?
আর দেখতে হবে ,
মৃত্যু মিছিলের সার ?
সারা পৃথিবী আজ অসহায়--
ঘর বন্দি

সুদূর কানাডা, আমেরিকা থেকে
শুরু করে ,
পশ্চিম বাংলার আনাচে কানাচে
কেবল বাংলার মানুষ আজ
দেখাচ্ছে সাহসিকতা ----
কারণ চলছে ভোট- করছে সবাই
রাজত্ব করার ফন্দি
কদিন পরেই পঁচিশে বৈশাখ,
গত বছরটা তো গেলো,
এই বছর ও করোনার সংক্রমণ
কেউ কি করবে গান, আবৃত্তি
আর নাচ?
কবি গুরু- রবি ঠাকুর -- তোমায়
জানাই প্রণাম।

দিন যদি আসে, নিশ্চয়ই মোরা
নাচে ,গানে ,এই দিনে তোমায়
জানাবো সম্মান ।

বেলা বয়ে যায় , সেই বারান্দায়
বসে একা,
এ যেন অবসর জীবন ---
মনটা বড়ই ফাঁকা।
ছেলে, মেয়েরা আজ দেশ ছেড়ে,
পাড়ি দিয়েছে বিদেশে,
করার কিছু নেই, -- হয়তো একদিন
এই বারান্দায় বসে--
প্রাণ চলে যাবে শেষে ,
আজও আছি ----
সেই বারান্দায় একা বসে ।

কবি তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ?

এষা দে মজুমদার

কবি তুমি কি শুনতে পাচ্ছো চারিদিকে হাহাকার !
কবি তুমি কি দেখতে পাচ্ছো চারপাশে মৃত্যু-মিছিল!
কবি তুমি কি অনুভব করতে পারছো সেই যন্ত্রণা?
যে যন্ত্রণা তুমিও পেয়েছো বারবার,
জীবনের ক্ষণে-ক্ষণে।

মানুষ আজ হয়েছে বড় অসহায়!
মানুষের অর্জিত বিদ্যা আজ পরাভূত |
যে মানুষ একদিন ভেবেছিল তার বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
কে প্রতিহত করতে পারবে না কেউ,
সেই উন্নত শির আজ লজ্জায় ভূলুণ্ঠিত,
নত মস্তকে স্বীকার করছে,
আমার অনেক শেখার আছে বাকি,
জানায় আছে ফাঁকি,
চাই আরো ধৈর্য, অধ্যবসায় আর মনঃসংযোগ।
তবেই আবার নতুন রূপে প্রকাশিত করবো নিজেকে |
অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জেগে উঠবো আবার,
বলবো, এস সবাই মিলে হাত ধরে,
এক নূতন স্বর্গ রচনা করি |
যেখানে থাকবে না কোন অবিশ্বাস,
থাকবে না সন্দেহ, লোভ,
হিংসা যেখানে প্রতি মুহূর্তে মাথাচাড়া দেবে না |
থাকবে শুধু বিশ্বাস, শান্তি আর ভালোবাসা |

কবি, তুমি তো কোনো বিশেষ দেশের, কালের নও,
তুমি সবার, তুমি আছো দুঃখে, আনন্দে, বিষাদে,
প্রতি পলে পলে তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য |
তুমি তোমার লেখনী দিয়ে মনে দাও ভরসা,
প্রাণে দাও মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা,
ওঠো কবি, জাগো চোখ মেলো,
নূতন সূর্যকে করো আহ্বান

বলো তুমিই সৃষ্টি, তুমিই লয়,
তুমি আছো, তাই আমরা আছি |
তোমার এই সুন্দর সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে দিওনা!
শুধু অন্ত হোক পাপের, পাপীর   নয় |

কবি তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে,
তুমি ছাড়া আমরা যে বড় অসহায়, একলা|
তাই তো বারে বারে হই তোমার   স্মরণাগত |
অবশেষে জানাই তোমায় প্রনাম ||

বিষন্নতা

নির্মল সি সাহা

ওগো, মন ভালো না লাগার সাথী,

খুঁজছি তোমায় হেথায় সেথায়

আকাশ প্রদীপ জ্বলছে মাথায়

তারাদের ভীড়ে গেছ হারিয়ে

আসবে কবে হাত বাড়িয়ে

কাটবে সময় মনের কথায়

উদাস মনের সঙ্গী তুমি, উদাসিনী

ভয়ঙ্কর এক কলকলানি স্রোতস্বিনী

দেখবো তোমায় মন জুড়িয়ে

নাইবা শুনলে মনের কথা

লুকোনো সেই চিনচিন ব্যথা,

এতো নয়, রাত জাগা হাজার কথা

লুকিয়ে আছে এক পাহাড় গোপন ব্যাথা

সে যে মন ভালো না লাগার কথা।

वक़्त गुजार ले संग संग

अमितेश

सारे ग़म बिसार दे ज़िन्दगी के संग संग
थोड़ा और वक़्त गुजार लें संग संग

उन लम्हों को जी लें फिर जरा
जो जिये ही ना गए हैं
उन तारों को गिन लें फिर जरा
जो गिने ही ना गए हैं.
इन अप्रतिम लम्हों के बहाने ही सही
थोड़ा और वक़्त गुजार लें संग संग

तेरी आँखों में जमी सुर्खी को
फैला के आस्मां पे फिर गोधुली कर दें
तेरे बिखरे से काजल से
रात में थोड़ी और कालिख भर दें
उन बिसरी हुई मुस्कान को तेरे समेट के
मुरझाई सी ज़िन्दगी में थोड़ा और ख़ुशी भर दें
इन अप्रतिम लम्हों के बहाने ही सही
थोड़ा और वक़्त गुजार लें संग संग

धुमिल से होते हमारे पदचिन्हों को संभाले हुए
उखड़ती हुई हमारी साँसों को सहेजे हुए
चलो ज़िन्दगी में कुछ और भी ज़िन्दगी भर लें
इन अप्रतिम लम्हों के बहाने ही सही
थोड़ा और वक़्त गुजार लें संग संग

क्या पता ये लम्हें गुजार न पाएं दुबारा
शायद इंतज़ार में पथरा जाएँ
आँखें हमारी फिर जीने को
इन दु:स्वप्नों में ही सही
थोड़ा और वक़्त गुजार लें संग संग

চিরসবুজ মনে

মঞ্জু বোস

সবুজায়ন সবুজ হবে
কেউ জানেনা কবে।
আবাসনকে সবুজ করা
যখন অন্যের মতে,
মনকে চিরসবুজ রাখা,
সেটাতো নিজেরই হাতে!
বয়েসটাকে ধরে যায় রাখা,
নাচের ছন্দে, সুরের আবেশে।
বয়েস তাদের স্তব্ধ করেনা,
যদি হও তুমি সবুজমনা।

কেটেছে যাদের ছেলেবেলা
সবুজে ঘেরা প্রকৃতিতে,
কেউ বা মাতে পশু,পাখি নিয়ে,
কারো ভরে মন সবুজ গাছে বা
রঙিন ফুলের কেয়ারিতে।
পরিণত বয়েসে ওঠে হাঁপিয়ে
শহরের দূষিত বায়ুতে,

প্রাণের পরশ পেয়েছে যে
তারা সবুজ বনানীতে।

সুখ, দুঃখের আবর্তন,
আসে সকলের জীবনে ,
দুঃখকে ঠাঁই না দিয়ে,
সুখে কাটাও দিন নিজের মনে।
থাকবে ভালো চিরদিনই
চিরসবুজ মনে।

বৈষম্য

নির্মল সি সাহা

নেতাদের বিমান গর্জনে আকাশ'টা করছে গুড়গুড়,
দিনমজুরদের হিসেবটা যে গরমিলে ভরপুর।
করোনা সংক্রমণ না হড়কা বান, বোঝা বড় দায়
আক্রান্তদের হিসেব রাখার নেই কোনো উপায়;
হাসপাতালে যাচ্ছে যারা, রাখছে কি কেউ খবর?
সুস্থরা ফিরছে, বাকি সবের হয় দাহ না হয় কবর;
আক্রান্ত আর মৃত্যুর হিসেব গোঁজামিলে ভরা,
যতই তুমি প্রশ্ন করো মিলবে না তার সাড়া।
রাজনীতিক আর স্তাবকেরা করছে আস্ফালন ;
মরছে মরুক গরীব গুর্বো, থামবে না ভাষণ,
যেনতেন প্রকারেণ, ক্ষমতা চাই, নেইকো ছাড়াছাড়ি;
জাতপাত, টাকাকড়ি, আস্ফালন, মিথ্যার ফুলঝুরি।
ভোট থামতেই খেলা শুরু ভ্যাক্সিন ভ্যাক্সিন,
ভ্যাক্সিন থাক বা না থাক, উৎসব চলে সারাদিন।
সারা গায়ে দগদগে ঘা, রক্তের ছড়াছড়ি,
প্রতিবিম্ব করছে তাড়া, পালাতে কি পারি?
মন্ত্রী মশাই যত্রতত্র করবেন ঘোরাঘুরি
আমরা সবাই দাবার বোড়ে, নেইকো বাড়াবাড়ি।
রক্তচক্ষু, লাঠির ঘা, তার উপর আছে গরাদের দরোজা ;
সব সত্ত্বেও, মরার আগে শিরদাঁড়াটা রাখতে হবে সোজা।

आशाएं

देबरीना पात्रा

जब जन्म लेता है इंसान तो आशाओं से भर जाता है माता पिता का मन,

तुरंत सोच लेते हैं एक नाम और आशा रखते हैं कि उनके नाम को करेगा उनका संतान रौशन।

बच्चा भी मन ही मन कितनी आशाएं बुन लेता है,

और बचपन से लेकर जवानी तक उन आशाओं को माता पिता के जरिए पूरा होते हुए पाता है।

फिर इस मनुष्य के जीवन में वह समय आ जाता है,

जब घोर संघर्ष के बावजूद वह अपनी आशाओं को टूटते हुए पाता है।

कुछ तो माता पिता और कुछ किताबों से मिली शिक्षा उसे बार बार प्रयत्न करते रहने का साहस देता है।

रण क्षेत्र में लड़ रहे एक वीर योद्धा के तरह वह संसार नामक इस रण क्षेत्र में विपदाओं और बाधाओं से जूझता रहता है।।

अचानक पृथ्वी पर महामारी, घोर निराशा के काले बादल छा जाते हैं ,

मनुष्य ,जो कि एक सामाजिक प्राणी है, अपने ही लोगों से मिलने से घबराते हैं।।

कुछ ही पलों में जैसे हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं,

और कुछ ही समय में जैसे एक दूसरे को अपना घनिष्ट मित्र मानने वाले लोग, मानो एक दूसरे का चेहरा देखने से भी घबराते है ।।

सबके मन में प्रश्न उठता है कि कौन है इस विनाश का जिम्मेदार

सब मानो मन ही मन ईश्वर से विनती कर मांगते हैं इसका उपचार।।

अपने प्रियजनों को खोने का डर इंसान को सोने नहीं देता,

धन, दौलत, ऐशो आराम मानो अब जिंदगी में कुछ मायेने ही नहीं रखता।

ईश्वर के कुछ दूत मनुष्य जाति को इस विपदा से बाहर निकालने का करते हैं प्रयास,

पर हर प्रयास मानो किसी काली शक्ति के सामने खो रहा अपना विश्वास।।

अमीरी गरीबी, काले गोरे का मिटने लगा तनाव,

मिट्टी से आएं हैं, मिट्टी में मिल जायेंगे, राख बन जाएंगे, ऐसी सच्चाई का होने लगा मनुष्य को एहसास।।

हर तरफ छा गया बर्बादी, मौत, हाहाकार और सर्वनाश।

प्रभु के चरणों में समर्पित किया तब मनुष्य ने अपना सर्वस्व

मानो कहा प्रभु से अब तुम ही बचाओ हमें , करो इस महामारी का विनाश।।

फिर अचानक एक दिन दिखने लगी आशा की किरण।

फिर से छाई धरती पर आशावादी हरियाली, फिर से मन के आकाश में उड़ने लगे आशावादी पंछी।

फिर से हृदय के समुंदर में उठने लगे आशा की लहर।।

मानव ने फिर ठान लिया कि हार न मानेंगे

निराशावाद से भरे इस युद्ध में आशावादी अस्त्र लेकर डटकर मुकाबला करेंगे।

अपने पूर्वजों के किए संघर्ष को मस्तिष्क में रखकर मानव ने किया आशा और विश्वास के अस्त्रों से अपने दुश्मनों का नाश,

एक बार फिर जीत का पैगाम लेकर आया प्रकृति।

एक बार फिर जीत का जश्न मनाया मानव जाति।।

পরিত্রাণ

নির্মল সি সাহা

বিশ্বজুড়ে করোনার আক্রমণ,
আক্রান্ত আর অনাক্রান্তের হাহাকার।
মানব জাতির চলছে অগ্নি পরীক্ষা,
জানেনা কবে মিলবে প্রতিকার।।

সবেতেই অকুলান, অক্সিজেন,
হাসপাতাল, ওষুধ, আর ডাক্তার।
অন্ধের যষ্টি 'করোনা-প্রতিষেধক',
শত খুঁজেও দেখা পাওয়া ভার।।

জবাবদাতারা ব্যস্ত সবাই,
ইমারত আর স্মারক দিয়ে নগর সজ্জায়।
চারিদিকে হাহাকার, অসহায় দেশবাসী,
কাতরাচ্ছে করোনা শয্যায়।।

করোনার ঘায়ে, প্রাণ হারিয়েছে
বিশ্বের অগুনিত মানুষজন।
অনেক হয়েছে, আর নয়,
থামুক বিশ্বব্যাপী আর্তের ক্রন্দন।।

মানুষ আজ দিকবিদিক শূন্য,
হন্যে হয়ে খুঁজছে উপায় বাঁচার।
সভ্য মানবজাতির কাছে,
এর থেকে বেশি আছে কি লজ্জার।।

সভ্য সমাজে, দেখতে হচ্ছে,
নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে অগুনিত লাশ।
মানব সভ্যতার লজ্জা, মানতে হচ্ছে,
আমাদেরই ভাগ্যের পরিহাস।।

ফিরুক শান্তি, আসুক ফিরে
পৃথিবীর সেই চেনা উন্মাদনা।
নিতে চাই প্রাণভরে নিশ্বাস,
বিদায় হোক, এই নরক যন্ত্রণা।।

জোরে জোরে বলতে চাই,
ভালো আছি, ভালো থেকো সবাই।
ফিরে আসুক বেঁচে থাকার বিশ্বাস,
নতুন এক সুস্থ সমাজ চাই।।

ইচ্ছা শক্তি

মঞ্জু বোস

কত প্রাণ আজ
পড়ছে ঝরে মহামারীর
অমোঘ মারে,
সারাটা দিন ভাবছি বসে,
আজকে যারা কাছে আছে,
কালকে কি আর
থাকবে পাশে?
চারিদিক ভরা হানাহানি
আর স্বজন হারানো
কান্নার রোল,
দেখছে সবাই রূদ্ধ শ্বাসে
উৎসব, মিটিং, মিছিলের ডামাডোল।
সেদিন তো আর
নয়কো দূরে,
ইচ্ছা শক্তি, মনের জোরে
নতুন দিনে দেখবো আলো,
প্রিয় জনের হাতটা ধরে।।

রাত্রি গভীর যতই হোক

রামধারী সিংহ দিনকর

অনুবাদ: তুষার চক্রবর্তী

রাত্রি গভীর যতই হোক,
নিশ্ছিদ্র আঁধার হয় হোক
সূর্য তো উঠবেই উঠবে,
সকালের ফুলও ফুটবে।

আসুক যতই দুঃসময়,
নিরাশাগ্রস্ত কখনো নয়,
কাটবে বেদনাভরা রাত,
বন্ধ হোক রুধিরপাত।

সবাই ক্লান্ত বড়ো, বাঁচছি একা,
লড়াইয়ের ময়দানে হবে দ্যাখা,
চলো ধরি হাতে হাত,
লড়তে হবে একসাথ।

আলো না অভিশাপ

অঙ্কুর মন্ডল

নতুন বছর, নতুন সকাল,
শীতবস্ত্র গায়ে সেদিন হেসেছিলাম এক গাল।
বিষের বিশ শেষ হলে দেখেছিলাম তাকে লাল।

নব অরুণের নব কিরণে, দেখেছিলাম সেই আলো;
হাত জোড় করে মিনতি করেছিলাম, হে ঠাকুর, রেখো সকলকে ভালো।

তারপর পেরিয়ে শীত, বসন্তও পার, নেচে উঠল সবাই;
আর কে আমায় হারাতে পারে, যেন লাফিয়ে ওঠে সবাই।

উন্মাদনায়, মত্ততায়, দুই মাস শুধু পেরিয়েছে গুটি গুটি;
হঠাৎ যেন, শাণিত হিল্লোল হয়ে অশনি সংকেত এলো ছুটি।

বিশের বিষ, সে মরে নাই, গোপনে ছিল এক চিলেকুঠি;
আজ জনম নিয়েছে, জাতক তার, ধরেছে সবার টুটি।

কি যে তার রূপ, কি তার ক্ষমতা, ত্রাহি ত্রাহি রব;
সুনসান করে, চারিদিক সে, থামিয়ে সব কলরব।

হাহাকার, শূন্যতায়, স্বজন হারিয়ে, আজ কাঁদছে মোদের দেশ;
তবুও কি সেই সংবাদ, শোনেনি কেও, নাকি যায়নিকো বিদ্বেষ?!

মানুষ মারার এই মারণ ফাঁদ, আজ বানিয়ে তোর এত ফুর্তি?
তবু ভুলে যাইনি, ইতিহাস কেউ, যেদিন ভেঙেছিল, রাজা হীরকের মূর্তি।

আজও আছে, কিছু সময়, বন্ধু মেনে চলো কিছু নিয়ম;
জিতবই মোরা, আর মরবে না কেউ, শুধু করবোনা অনিয়ম।
চেয়ে দেখো, পৃথিবীতে, কোনো দেশে নেই এই ক্রন্দন;
আমাদের দেশেই মানুষেরা মরে শুধু থেমে যায় হৃদস্পন্দন।

তাই সময় এসেছে, ভেবে দেখার, আলো কি হয়, কোনওদিন অভিশাপ?
নিজেকে বাঁচাও, দেশকে বাঁচাও, দূর করো যত পাপ।

লাগাও গাছ, ফোটাও ফুল, ছোটদের আগামী ভরিয়ে তোলো;
তাদের জন্যে, দুহাত মেলো, হৃদয়কুসুম ফুটিয়ে তোলো।

आम का सफर

नंदिनी सेन

समय का पहिया चलता रहा,
कितना कुछ सिखाता गया
बचपन की वह मीठी यादें,
दोस्तों के संग लगाये वो हँसी के ठहाके

फागुन के महिने से, उभरे हुए बौरो को देख,
मन को सुकून मिलता, कर लेते दो आँखे सेंक,
रह गया था महिने भर का इन्तजार
फिर कच्चे आमों की छायेगी बहार

अप्रैल के महिने में, कच्चे आम का पन्ना हो
या फिर दाल में घुली हुई टुकड़े हो
गर्मी से लड़ने की ताकत देती
हर कोई बीमारी से हमको बचाती

मई की झुलसती गर्मी में
जब तापमान रहें ऊचाई में
तब आम धीरे-धीरे पकने लगे
ओर ज्यादा स्वादिष्ट बनते गये

देख जून का महीना आया,
साथ बारिश की फुहारे लाया
मीठे आम मिलने लगे बाज़ारो में
बगीचो, गलियों और हर घर में

आम की लस्सी या हो शरबत
बूँद बूँद के लिए करते कसरत
पेड़ो पर भी चढ़ जाते अक्सर
हाथ से निकल न जाये कोई अवसर

जुलाई, अगस्त बीता ऐसे
मानों पैरों में पहिये हो जैसे
एक एक आम बन गया खज़ाना
मुश्किल होता गया अब मिलना

विदायी की घड़ी नज़दीक आई
साथ में दुःख भरी आहे लायी
अब फिर से करना होगा इन्तजार
अगले साल कि नई फुहार

आम का सफर पूरा हुआ
हमें भी सिखाता गया,
मीठा होता है फल सब्र का
मज़ा ले लो, ज़िदंगी के हर पल का

समय का पहिया चलता रहा
कितना कुछ सिखाता गया।

আমি একা

অতনু চট্টোপাধ্যায়

চারিদিকে ধূ-ধূ প্রান্তর-
রিক্ত পাষাণ পর্বত শিখর,
লেলিহান অগ্নি, বায়ুর ঝোঁকা।
তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আমি একা,
শুধুই একা-

চেনা মুখগুলো বহু দূরে-
ভাব-ভালোবাসার বহু পথ ঘুরে,
নির্জনে আমি আমর সাথে দেখা!
আমি একা, শুধুই একা-

প্রেম-ভালোবাসা বন্ধুত্ব,
জুড়ে থাকবার শুধুই একটা ছুতো,
আমায় ভুলে সবাই আজ ন্যকা।
কঠিন বাস্তবে দাঁড়িয়ে আমি একা,
শুধুই একা-

সময়ের আবর্ত বড়ই নিঠুর
পর তো পরই, আপনও হয় দূর,
চলতে চলতে থমকে গিয়েছে চাকা!
নির্জনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত আমি একা,
শুধুই একা-

কি পেয়েছি, আর কি হারালাম,
জীবন দিয়েছে কিইবা দাম?
হিসাব নিকাশের অঙ্কটা শুধু ফাঁকা!
নির্জনে দাঁড়িয়ে হতবাক আমি একা,
শুধুই একা-

যদি

রিমঝিম

যদি ....
পারতাম তোকে দিতে একটা হাসি
পাতলা ঠোঁটের ঝিলিক চোখের কোণে,
আকাশের ওই রামধনু কে ছুঁয়ে
রং কুড়িয়ে দিতাম তোকে এনে।

থাকতো যদি গোপন সোনার কাঠি,
জুড়ে দিতে কোমল হৃদয় ভাঙা,
সব ভুলে চল পিছন ফিরে খেলি,
ছোট্টবেলার সেই যে কুমির ডাঙ্গা।

ঘুম হারা সব সাতকাহন এর নিশি,
চোখের নিচে কাজল ঘন ছায়া,
চাই দিতে এক স্বপ্নে মোড়া বাঁশী
সুরের রেশে সব ভোলানো মায়া।

শুকনো মুখে ক্লান্ত পায়ে চলিস,
দু চোখ খোঁজে একটু অবকাশ,
চাই যে দিতে বৃষ্টি ভেজা বিকেল
তারার হীরেয় জড়ানো আকাশ।

ইচ্ছেগুলো সত্যি যদি হতো,
শান্ত পরশ, চোখ মোছানো গান,
মনের জোরের আশায় বুক বাঁধি,
নতুন ভোরে জাগবে নতুন প্রাণ।।

Envy

Nandini Sen

The alarm clock rang incessantly
Shaking Jane from her peaceful slumber.
She grumbled it was too early
Can I not sleep, just a wee little more?

Off to school, after a hurried breakfast
And a lunchbox packed with the mundane meal
She wondered all the way,
Why do I have to go to school
Can I not play around, just a wee little more?

At the classroom, she chatted with her friends,
Exchanging stories of their adventures galore.
Just then their teacher entered inside
With chalk, duster and a smile on her face

Jane looked at her teacher with rapt attention
Always tip top, wearing colourful attires
Her long hair, sometimes flowing,
Sometimes braided or tied in a bun

She too wished to come to school
In all her favourite party dresses
Instead she had to wear this damned uniform
Each and every day without fail

How she wished she could be like her teacher,
Wearing a different dress each day
Giving away homework and checking their work
Taking exams instead of giving one

The teacher on the other hand
Loathed her job from the core
How she wished she could play around,
Just like her students, a wee little more

How lucky were these children
All they had to do was study and play
A plate of hot meal always waited
Whenever they felt to eat

Carefree children, free from burden
No compulsion to cook or clean
Free from jealousy, competition & pressure
And all other life's miseries

Why oh why did she grow up so fast
Being a child was so much fun
Couldn't she travel back in time
And enjoy childhood, just a wee little more

Neither the teacher,
Nor her students
Could ever think in their wildest dreams
That they were the objects
Of each other's envy

গলে মোম জ্বলি আমি

রিমঝিম

সামনে রাখা মোমবাতিটার মতো
জ্বলছি গলছি আমি....
প্রশ্ন চিহ্ন ঝড়ে, মন দোলাচলে,
কাঁপছে মোমের শিখা
রাজনীতি আজ পরিবার নীতি,
টানে অদৃশ্য স্পষ্ট বিভাজন রেখা
আত্মীয়তা কি শুধু বয় আজ ধমনীতে?
প্রেম ভালোবাসা র সংজ্ঞা -
অকশন হাউস
প্রশ্নে জ্বলে পুড়ছি, গলে আজ,
মোমবাতিটাও, আমার মতই একা।।

বৃত্ত

নীলাঞ্জনা জি বসু

জীবন।
ব্যস্ততা।
অপূর্ণ প্রত্যাশা।
হতাশা।
একাকীত্ব।
নীরবতা।
প্রকৃতি।
শান্তি।
উপলব্ধি।
জীবন।

প্রশ্ন

রিমঝিম

সীতা মা, তোর পাতাল প্রবেশ কেন?
পরীক্ষার ওই ক্লান্ত অভিমানে?
পুরুষোত্তম কে ত্যাগ দিলি কি সেদিন
যেদিন রাতে রেখে এলো বনে?
মা তোর কার ‘পরে বল সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ
পতি, পিতা, দুই পুত্র, অযোধ্যা?
অযোধ্যার একটি মেয়েও পায়ে পড়েনি মা?
যে বলেছে, যথেষ্ট হয়েছে
মা তোমাকে আমরা ছাড়বো না
যথেষ্ট তুই দিলি পরীক্ষা
আর অপমান সইতে হবে না।

রাই, তুই মিছেই কলঙ্কিনী হলি
দোষ শুধু তোর আকুল ভালোবাসা
আয়ান যদি খাঁটি প্রেমের ডোরে
সমর্পিত হতো দুই নয়নে
চাইতি কি তুই অন্য কারো পানে
কারোর বাঁশির সুরে আত্মহারা?

দ্রৌপদীও একজনকেই চেয়ে
বাধ্য হলো পাঁচের স্ত্রী হতে
দ্যূত সভায় চরম লাঞ্ছনা
পরমবীর পঞ্চ স্বামী রইলো খাড়া নীরব
আব্রু রক্ষায় মাত্র সখা মাধব।

অপমান তোর আজও চলে নারী
এই যুগেতেও কমেনি এক কণা
সব রূপেতেই, স্ত্রী, মাতা, কন্যা
কত মেয়ে যে আজও পাতাল খোঁজে
তবুও কেউ বুঝেও বোঝে না।
অবিশ্বাস আর প্রশ্নেতে জর্জর

দোষারোপ তো আজও ছাড়ে না।

লড়তে লড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে,
কখনো হয়ে পাগল, পথঘাটেতে ফেরে
আর নয়তো চরম পথটা বাছে,
ব্রাত্য হয়ে আপনজনের কাছে।

অনেক হলো লক্ষ্মী রূপে থাকা
ভরিয়ে তোলা খড়-কুটো সংসার
দুর্গা বা কালী র রুদ্র রূপে
কর শুরু ফের অসুর সংহার।।

অনুরাগী

নির্মল সি সাহা।

রামু 'ডাক অফিস' থেকে ঘুরে এসে বেশ কয়েকটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিল। ওকে বলা আছে, প্রতিদিন খাওয়া দাওয়া করে একবার 'ডাক অফিস' ঘুরে আসার জন্য। যেহেতু একটু-আধটু লেখালেখি করি, তাই প্রায়ই কেউ না কেউ কিছু লিখে পাঠায়। তাছাড়া ব্যাঙ্ক, বিমা, পাবলিশার, কখনো-সখনো ভাইপো ভাইঝির কাছ থেকে চিঠিপত্র আসে। দিনকয়েক আগে আরতির কাছ থেকে পাওয়া জন্মদিনের শুভেচ্ছায় লেখা ছিল "ষাটতম জন্মদিনের শুভেচ্ছা"। প্রতিবছর জন্মদিন উপলক্ষে ওর শুভেচ্ছা বার্তায় 'তম' কথাটার আগে লেখা সংখ্যা দুটো দেখে একবার করে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠে, তবুও ব্যাপারটা উপভোগ করি। সেই কলেজ জীবনে আরতি'র সাথে পরিচয় হয়েছিল। এখনকার মতো গল্প লেখার ব্যামো তখন ছিলোনা। তখন যৌবনের টগবগ করা রক্ত দিয়ে কবিতা লিখতাম আর কলেজ গিয়ে বন্ধুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে তা সবাইকে পড়ে শোনাতাম। তাছাড়া কলেজের দেওয়াল পত্রিকায়, কলেজ ম্যাগাজিনে এবং ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রতিবাদী লেখা লিখতাম। আমার প্রতিবাদী লেখা একদিকে যেমন অনেকেরই নজর কেড়েছে তেমনি আলোচনা সমালোচনা ও কম হয়নি। যখন কেউ আমার লেখা নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করতো তখন বেশ মজা পেতাম। মনে মনে ভাবতাম, লেখাটা বোধহয় সঠিক হয়েছে। এইভাবে স্কুল জীবনের শেষ দিক থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত লেখা চালিয়ে গেছি। আমাদের বন্ধুদের গ্রুপে আরতি ছিল সবার কাছে মক্ষিরানী। আরতি ব্যাপারটা বুঝতো এবং সেটা চেটেপুটে উপভোগ ও করতো। কলেজ জীবন শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম, সেখানেও আরতি পিছু নিল। আমার কাছে কলেজ জীবনের আরতি ইউনিভার্সিটিতে এসে আলাদা রূপে ধরা দিল। হঠাৎ করেই এই আরতি কলেজ জীবনের উন্মাদনা কাটিয়ে ভীষণ শান্ত হয়ে গেল। তখন আরতির সঙ্গী বলতে আমি একা, কলেজের বাকিরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে গেছে। তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়া, লেখালেখি করা আর খুচখাচ দু'একটা টিউশন ছাড়া করার কিছুই ছিলনা। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ও বছর দু'য়েক ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এরই মধ্যে বারকয়েক কয়েকজন পাবলিশারের সাথে দেখা করে আমার লেখা কবিতাগুলো ছাপানোর কথা বলতে গেছিলাম। আমার লেখা দেখে এমনভাবে তাকাতো, মনে হতো, যেন কোন এক গর্হিত কাজ করেছি। ফলে লেখালেখি উপর উৎসাহ ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। হঠাৎই একদিন

আরতি কলেজ স্ট্রীটের এক রেস্টুরেন্টে বসে অত্যন্ত শান্তভাবে বললো সব জল'ই তো নদী বা সমুদ্রে মেশে না, তেমনি সব ভালোবাসাও বিয়েতে পরিণতি পায়না। কিন্তু ইচ্ছে করলে বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করা যায়। ওর এই কথা ও আজও অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে। আমার জন্মদিন থেকে শুরু করে যে কোন অনুষ্ঠানে আমাকে বার্তা পাঠিয়ে স্মরণ করে। ওইদিন রেস্টুরেন্টে ওর পছন্দমতো খাবার খাইয়ে হাসিমুখে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল হলুদ আর সিঁদুর মাখা একটা খাম, যাতে লেখা ছিলো, ওর নতুন জীবনের গন্তব্য। বুঝে গেছিলাম জীবনটা আবেগের হাত ধরে নয়, চলে বাস্তবের কঠোর রাস্তা ধরে। চেষ্টা করতে করতে আচমকাই খোদ মহাকরণে বসে কলম পেষা'র একটা কাজ জুটে গেছিলো, যা দিয়ে শখ আহ্লাদ মিটুক বা না মিটুক সময়টা দিব্যি কেটে যাচ্ছিলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস ফাইলে মুখ গুঁজে থাকা তারপর উদ্দেশ্যবিহীন সরণিতে পায়চারী করা, এই হয়ে উঠেছিলো আমার দৈনন্দিন কার রুটিন।

এমনিভাবে অনেকগুলো বছর কেটে গেলেও মনটা ঠিক থিতু হচ্ছিলো না। এরই মধ্যে সাংসারিক জীবনে ঘটে গেছিলো বেশ কয়েকটি ঘটনা। বয়স্ক ঠাকুরমার স্বর্গ লাভের কিছুদিনের মধ্যে তাঁর একমাত্র ছেলেকেও কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বাউনণ্ডলে জীবনে বিয়ে-থা আর করা হয়ে উঠেনি, যদিও বন্ধুবান্ধবরা মজা করে বলতো "ল্যাং খাওয়া ব্যাচেলার"। বিয়ে নিয়ে ভাবতে গেলে আরতির সেই বিখ্যাত চিঠির কথা মনে পড়ে। ওর বিয়ের কয়েক মাস পর আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিল "সেদিন রেস্টুরেন্টে বসে আমার বিয়ে নিয়ে একটি কথাও বললি না, জানতাম বলবি না। তুই ভাবিস না তোর ব্যক্তিগত রোজগার নেই বলে আমি অন্য জায়গায় বিয়ে করেছি। তোকে জীবনসঙ্গী করে এগোবার সাহস পাইনি, তার একমাত্র কারণ, আমি বুঝেছিলাম, তোর মনের মধ্যে আমার সতীন ঘুমিয়ে আছে। সে যখন জেগে উঠবে তখন আমার কোনও জায়গা থাকবেনা। জানিস আমার সতীনের নাম কবিতা বা প্রতিবাদী লেখা নয়, উপন্যাস। তাকে জাগিয়ে তোল, তোর মনের অস্থিরতা কেটে যাবে।" বাবা মারা যাবার পর আমার একমাত্র ছোটভাই বললো এবার আমাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ হওয়া দরকার। ভাই নিজেই তদ্বির করে একদিন লোকজন নিয়ে এসে সবকিছু তিন ভাগে ভাগ করে নিল। একভাগ মা'য়ের নামে, আর দুভাগ আমাদের দুই ভাইয়ের নামে। সব কিছু ভাগ হলেও কেন জানিনা, ভাতের হাঁড়ি ভাগ করলো না। আমি আগের মতোই খাওয়ার সময় খাওয়াটা পেয়ে যাচ্ছিলাম, ফলে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। আমাকে সংসার থেকে চলে যেতে কেউ কিছু না বললেও, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সময় ধরে কলম পিষতে আর সংসারের কোলাহলে নিজেকে ধরে রাখতে মন থেকে সায় দিচ্ছিলো না। আজকাল আরতির সেই সতীন একটু বেশিই বিরক্ত

করা আরম্ভ করেছিলো। চাকরিটা বরাবরই করতাম, জীবন ধারণের জন্য রসদ জোগাড় করতে আর সময় কাটানোর জন্য, মন থেকে ভালোবেসে নয়। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারার ফলে হাতে বেশ কিছু টাকা চলে এসেছিলো। তার উপর হিসেব কষে দেখলাম, বিগত কুড়ি বাইশ বছর চাকরি করার পর আজ যদি চাকরিকে বাই বাই বলি, তাহলে আরও বেশ কিছু টাকা পকেটস্থ হবে, সাথে আজীবন একটা পেনশনেরও বন্দোবস্ত আছে। তাছাড়া নিজস্ব জমানো কিছু টাকা আছে। যোগবিয়োগ'এর অঙ্কটা মিলে যেতেই দিলাম চাকরিটা ছেড়ে। ভাইকে বললাম আমার ভাগের অংশ রইলো তোর কাছে, মা'কে দেখাশোনা করিস। যোগাযোগ থাকবে, আপাততঃ চললাম। আমাদের বাড়িতে কাজ করতো রামুর মা। তাকে বললাম রামুর দায়-দায়িত্ব আমার, সাথে নিয়ে গেলাম। বাধা দেয়নি বরং ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছিল, কাকুর হাত ছাড়িস না। সেই থেকে আমার আর রামুর বসবাস এখানে। এই রাজনগর গ্রামে এসেছি তাও প্রায় দশ বছর। এখানকার লোকেরা পোস্ট অফিসকে 'ডাক অফিস' বলে, সেটা নেপালগঞ্জে, এখান থেকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে। গ্রাম্য রাস্তা ধরে যেতে আসতে ঘন্টা দুয়েক লাগে। এখানে রামুর নামে বসত ভিটে ছাড়াও কিছু চাষের জমি কিনে দিয়েছি। এমনকি একটা টুকটুকে বৌও এসেছে রামুর ঘরে। ওরা একদিকে থাকে আরেক দিকে আমার থাকার ব্যবস্থা। রামুরা থাকার ফলে আমাকে সংসারের কিছু নিয়ে ভাবতে হয়না। যখন যা প্রয়োজন না চাইতেই হাতের কাছে হাজির হয়ে যায়। যদিও সংসারের ব্যাপারে আমি বরাবরই শতহস্ত দূর। এখানে বসেই আমার লেখালেখির কাজ, মাঝেসাঝে শহর থেকে পাবলিশারের লোকজন, কখনো মা সহ ভাইয়ের ফ্যামিলি বা বন্ধুবান্ধব আসে। এছাড়া সময়-সুযোগ পেলেই আরতি তার বর আর বাচ্চাদের নিয়ে এসে এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যায়। সারাদিন লেখালেখি আর সন্ধ্যেবেলা হাটের চা'য়ের দোকানে বসে একটু আড্ডা, সাথে দু-এক কাপ চা, এইভাবেই কাটে।

এরইমধ্যে এক মহিলা'র চিঠি এসে হাজির। তাতে লিখেছেন, "আমি সেদিন কলেজ স্ট্রিট পাড়াতে বই কিনতে গিয়ে আপনার লেখা 'অপরাজিতা' বইটা নেড়েচেড়ে ভালো লাগায় কিনেছিলাম। পড়ে মনে হলো আপনি আমাকে নিয়ে লিখেছেন, অথচ আমি জানতে পারলাম না। এটা কি ভাবে সম্ভব! আপনার ঠিকানা জোগাড় করতে শুধু কালঘাম ছুটেছে তাই নয়, আমাকে একটা মাস সময়ও ব্যয় করতে হয়েছে। আপনার ফোন নাম্বার পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে চেষ্টা করেছি, সবাই বললো আপনি ফোন ব্যবহার করে সময় নষ্টকারীদের দলে নেই। এবার বলুন আপনার সাথে কিভাবে দেখা করতে পারি। দেখা আমাকে করতেই

হবে। আমার সাথে আপনার কখনো পরিচয় হয়েছে বলে মনে হয় না, তবুও কিভাবে আপনি অপরাজিতা লিখতে পারেন, সেই রহস্য আমাকে জানতেই হবে। আপনি রাজি না হলেও ঠিকানা খুঁজে ঠিক পৌঁছে যাব। সাথে আমার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার পাঠালাম। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। ভালো থাকবেন। ইতি - একজন অপরিচিতা"। আমি সাধারণতঃ সবারই চিঠির উত্তর দেই, কিন্তু এতো অন্য পাঁচটা চিঠির মতো নয়। একটু ভেবে, দিন দু-এক পর, হাটের টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতেই আমাকে বললো "দেখুন ঘোষ মশাই, পয়সা আর সময় নষ্ট না করে কবে কোথায় দেখা করা যায়, সেটা বলুন। আমার দেখা করতেই হবে। অনুগ্রহ করে আমাকে বাধা দেবেন না। আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবোনা। খানিকক্ষণ কথা বলেই চলে আসব।" অগত্যা বললাম যে ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছেন সেখানে আসতে পারেন। কবে আসছেন, আগে থেকে জানালে সুবিধা হবে। পথ নির্দেশিকা দরকার হলে বলবেন, লিখে পাঠাব। বাড়ি ফিরে ভাবতে লাগলাম আমার 'অপরাজিতা'র সাথে কি মিল হতে পারে এই অপরিচিতা'র! আমার অপরাজিতা ছিল সমাজ জীবনের এক লড়াকু মেয়ে, যার বেঁচে থাকার প্রতিটি লড়াইয়ের চিহ্ন সমাজের বুকে এঁকে রেখে গেছে, আজ সে নেই, কিন্তু ঐ চিহ্নগুলো এখনো দগদগ করছে। তাহলে ইনি কে, যে আমার সাথে দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আমার অপরাজিতা পাঠক-পাঠিকাদের কছে অমর। তাকে কেন পোস্টমর্টেম করতে চাইছেন। অপরাজিতা দু'জন হতে পারেনা। আমার অপরাজিতা আমার কাছে একজনই। কয়েকদিন পর একটা চিঠিতে লিখলেন, "সামনের মাসের দ্বিতীয় রবিবার আসছি। গিয়ে কথা হবে"। হিসেব কষে দেখলাম হাতে এখনো বেশ কিছু দিন বাকি। লেখালেখির ফাঁকে একদিন বাড়ি থেকে সাথে আনা অযত্নে পরে থাকা তোরঙ্গটাকে ঝেড়ে মুছে আমার অপরাজিতা'কে বের করলাম। মনটা একটু হলেও দুরুদুরু করছে, অপরিচিতা ,অচেনা এক মহিলা এসে অপরাজিতা সম্বন্ধে কি না কি জানতে চায়, তাই একটু প্রস্তুতি।

অবশেষে রবিবার আসতেই আমার অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু হয়ে গেল। সারাদিন অপেক্ষা করে অনেকটা বিরক্ত হয়ে অভ্যাস মতো সন্ধ্যের সময় চা'য়ের আড্ডায় বেরিয়ে গেলাম। হঠাৎই রামু আমাকে চা'য়ের আড্ডায় এসে খবর দিল, একজন ভদ্রমহিলা আমাকে খুঁজছেন। ফিরে এসে দেখি, বছর পঁয়তাল্লিশের সাধারণ জামা-কাপড় পরা, অবিন্যস্ত চুল, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ, একজন মহিলা আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে বললো, ক্ষমা করবেন, একটা বিশেষ কাজে আটকে গেছিলাম, এসে পৌঁছাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। আপনাদের অসুবিধা না হলে আজ রাতটা যদি আমায় থাকতে দেন, কাল সকালে চলে যাবো। ভাবছি কি করবো, একেতে অপরিচিত মহিলা তার উপর রাত্রিবাস করতে চাইছে। তাছাড়া এতো রাতে কোথায়ই বা যাবে, শহরে যাওয়ার শেষ বাস টা'ও এতক্ষণে ছেড়ে গেছে, সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বললাম আমার পাশের ঘরে অথবা ওদের সাথে

থাকতে পারেন। মহিলা আমার পাশের ঘরে থাকবেন বলে স্নানাগারে চলে গেলেন। স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে এসে চা নিয়ে আমার সামনে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসলেন। আসার পর যে চেহারায় দেখে ছিলাম এখন তার থেকে বহুগুণ ভালো দেখতে লাগছে। এককথায় বলতে বেশ সুন্দরী। প্রথমেই ব্যাগ থেকে ওনার সচিত্র পরিচয়পত্র বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা আপনার কাছে রাখুন, যাওয়ার সময় আমাকে দিলেই হবে। পরিচয়পত্র'টায় নজর পড়তেই বুঝতে পারলাম ওঁর নাম কণিকা গাঙ্গুলি। সাথে সাথে পরিচয়পত্র'টা ওঁকে ফেরৎ দিয়ে বললাম, এর দরকার হবে না। কণিকা'র মুখোমুখি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার মনে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছিলো, ও আমার একনিষ্ঠ অনুরাগী, আমার লেখা ওঁকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছে যে, উৎসাহী হয়ে, আমার সাথে দেখা করতে চলে এসেছেন। কিন্তু কণিকার সাথে প্রাথমিক আলাপচারিতায়, আমার মনের এই ভ্রান্ত ধারণাটা নিমেষে মিয়িয়ে গেল। ওঁর সাথে কথাবার্তায় জানতে পারলাম, ওঁর ব্যক্তিগত জীবন হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হলেও বেঁচে থাকার জন্য রসদ খুঁজে পায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। শত দুখেঃ ও দিনের শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গান ওঁকে প্রেরণা জোগায়। অনেকেই বাড়িতে আরাধ্য দেব-দেবী'দের পূজা করে, সেই জায়গায় কণিকা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান আর গীতাঞ্জলি'কে শিয়রে রেখে পুজো করে। ওর স্মরণে-শয়নে-স্বপনে রবীন্দ্রনাথ বিরাজমান, ও আসলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী।

রাতের খাওয়া সেরে আমার সাথে অপরাজিতা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পরেই আমরা আপনি সম্বোধন ছেড়ে তুমিতে নেমে এসেছি। কথায় কথায় জানতে পারলাম কণা অর্থাৎ কণিকা উচ্চশিক্ষিতা এবং কর্মরতা। আমার লেখা অনেক ক'টা বই পড়েছে। অপরাজিতা নিয়ে আলোচনায় কণা নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনা বললো যা সত্যিই অপরাজিতার সাথে হুবহু না হলেও অনেকটাই মিল। আমার অপরাজিতা ছিল আর্থিক ভাবে খুবই দূর্বল, বিধবা মা'কে নিয়ে থাকতো একটা বস্তিতে। মা মেয়ে'তে লোকের বাড়িতে ঘর মোছা, বাসন মাজা, ফাইফরমাশ খাটা, এই করে চলছিল। কিন্তু কাল হলো, অপরাজিতার কিশোরী থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণে শরীরের ফর্সা রঙ আর সুন্দর মুখশ্রী। হঠাৎই নারীদেহ পিপাসু ভীমরুল'দের আঘাত আর অত্যাচারে একসময় ঠিকানা গিয়ে দাঁড়ায় 'লাল বাতির মহল্লায়'। শত প্রতিবাদ করেও বাঁচাতে পারেনি নিজেকে। অত্যাচারিত হতে হতে পিঠটা যখন দেওয়ালে ঠেকে গেল, তখন খুনের দায়ে কপালে জুটলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডআর সেখানেই স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলো , চিরবিশ্রামের জায়গা। আর কণার ক্ষেত্রে শুধু শরীর নয়, সাথে তাঁর সামাজিক অস্তিত্ব নিয়েও টানাপোড়েন করে চলেছে আমাদের সমাজ। যখন কণা'র মাত্র বারো বছর বয়স, গ্রামের স্কুলে পড়ে, তখন প্রবল বাধা দিয়েও সমাজের শকুনগুলোর হাত থেকে নিজের দেহটাকে বাঁচাতে পারেনি। বিচার তো পেলোইনা উল্টো সমাজের দণ্ডমুণ্ড'দের বিধান মেনে 'কুলটা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গ্রাম ছাড়া

হতে হয়েছিল। এতো করেও ভেঙে পড়েনি কণা, মা-বাবার সহযোগিতায় শহরে এসে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই শুরু করলো। লেখাপড়া শিখে একটা চাকরি জোগাড় করে নিল। কিন্তু সেখানেও বাদ সাধলো সহ-কর্মীরা, কারণে অকারণে ভুল খুঁজে মানসিক ভাবে অত্যাচার করা শুরু করলো। পদোন্নতি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারে পদে পদে বাধা দিতে লাগলো। তাছাড়া অফিসের বস্ থেকে আরম্ভ করে সমাজের অনেকেই, জীবনসঙ্গী নয়, শয্যা-সঙ্গী বানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। একা এইভাবে বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েছে। তার সাথে শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণব্যাধি ক্যান্সার। এখানে আসার আগে বেশ কিছু দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছে। আজ ও আসার আগে হাসপাতালে গিয়ে আগামীকাল কেমো নেওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এখানে আসতে দেরি হয়ে গেছে। এতোকিছুর মধ্যেও কণা কবিগুরুর সৃষ্টি থেকে উজ্জীবিত হয়ে ওর নিজের জীবনকে ভালোবাসে এবং বাঁচতে চায়। কিন্তু ওর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে কিভাবে অপরাজিতা'র মিল হয় তা জানতে এতো দূর ছুটে এসেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে হাতে সময় খুবই কম, তাই তাড়াহুড়ো করে এখানে আসা। সব বলার পর আমার কাছে জানতে চাইছে কে ঠিক, অপরাজিতা না কণা। আমি অনেকক্ষণ বাকরুদ্ধ থাকার পর নিজের অজান্তেই কণার মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনা দিয়ে বলেছি, অপরাজিতা হচ্ছে কল্পনা আর তুমি হচ্ছো বাস্তব। আমি ভাবতেই পারছি না আমার অপরাজিতা কণা হয়ে এভাবে ধরা দেবে। কণা, অপরাজিতা এঁরা অপরাজেয়। কণা করুণ কন্ঠে বললো, "লেখক, তুমিতো সবার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াও, আমাকে কি তোমার বুকে একটু মাথা রাখতে দেবে, ক্ষণিকের শান্তির জন্য!" না বলতে পারিনি, সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম তুমিই প্রকৃত লড়াকু, অপরাজেয়, আর অপরাজিতা হেরে গেছিলো, শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি, ও সমাজের চোখে পরাজিত। তারপর ওকে পাশের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে, আমি নিজের ঘরে ফিরতেই কানে ভেসে এলো, কনা মনপ্রাণ দিয়ে গান গেয়ে চলেছে-:

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি--
তবু মনে রেখো।
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
তবু মনে রেখো।
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে-- মনে রেখো।
যদি পড়িয়া মনে

ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে--
তবু মনে রেখো।

আমি অন্তঃ দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করছিলাম, কণা'র দু-চোখ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ জমানো অশ্রুধারা। পরদিন সকালে ও হাসপাতালে যাবে বলে আমাকে ডেকে দিতে বলেছিল, তাই আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েছিলাম।

তার আর দরকার হয়নি, সকাল থেকে থানা-পুলিশ, মর্গ সেরে সন্ধ্যের সময় আমার, রামু'র আর দু-চারজন গ্রামবাসীর কাঁধে চড়ে চিরশান্তিতে চলে গেল। এখনো কানে ভাসছে "তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে....."

पारकर पेन

अमितेश

कब पापा सुपर हीरो से सुपर जीरो हो गए थे, सुकृत को पता भी नहीं चला.

याद है ना कैसे पापा अपनी साइकिल में आगे की रॉड पे एक छोटी सीट लगा लाये थे. तब सुकृत कितना खुश हुआ था. लगा की पापा कितना ध्यान रखते हैं उसका. जब वो उस छोटी सीट पर बैठ कर शहर घूम जाता था, दोनों हाथ हवा में फैलाये, उसे लगता की उस एक पल को वो सुकृत नहीं सुपर कमांडो ध्रुव हो गया है. पापा साइकिल पर पैंडल भी जब मारते तो साइकिल हवा से बात करती. सुकृत उस छोटी सीट पर बैठ जैसे हवा में उड़ रहा होता. कभी एक हाथ से अपने उड़ते बालों को आँखों से हटाता कभी पीछे छूटते लोगों को मुँह चिढ़ाता. तब लगता पापा सच में सुपर हीरो हैं. उसके किसी भी दोस्त के पापा की साइकिल में आगे की रॉड पर छोटी सीट नहीं लगी थी. वो इस मामले में खुद को अपने सब दोस्तों से बेहतर मानता था.

जब स्कूल में Attendance लगाई जाती और उसका नाम "सुकृत" पुकारा जाता तो कितना गर्व से खड़ा हो कर वो "Present Miss" बोलता. गर्व क्योंकि उसका नाम क्लास में सबसे अलग था और शायद सबसे बेहतर भी, कम से कम वो तो यही सोचता था. यह नाम भी उसके पापा ने ही दिया था - सुकृत. उस दौर में जब सबके नाम प्रसून, मिथिलेश, रामेश्वर होता था, उसके पापा ने कितना नया नाम रखा था... एकदम Unique, कितने अलग थे ना उसके पापा. सबसे अलग, सबसे अच्छे.

सबसे अच्छा तो उसे तब लगता जब नयी क्लास में जाने पर उसकी सारी कॉपी क़िताब नयी होती और एक Sunday को बैठ कर पापा उसकी सारी कॉपी क़िताब पे रंग बिरंगे जिल्द लगाते थे. पता नहीं कहाँ कहाँ से रंग बिरंगे मोटे कागज पापा खरीद कर लाते थे, जिल्द लगाने के लिए. एक Subject की कॉपी - किताब पे एक रंग का ही कवर लगाते थे. फिर उस पर सलीके से Name Plate चिपकाते और सब पर स्केच पेन से उसका नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और सब्जेक्ट लिखते थे. कितनी अच्छी Handwriting थी पापा की.

फिर उस कवर के ऊपर सैलोपिन पेपर का कवर लगाते कि कवर समय के साथ गंदा ना हो जाये. तीन तीन के सेट बन जाते थे रंग बिरंगे कॉपी किताबों की - एक CW, एक HW और एक उस सब्जेक्ट के किताब की. फिर उसे सिर्फ सब्जेक्ट के कवर का कलर याद रखना होता था - और झट से वो कॉपी बैग से बाहर. बार बार उसे कॉपी निकाल निकाल कर खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी की सही सब्जेक्ट की कॉपी निकाली है या नहीं. कितने अलग थे ना पापा. शायद सुपर हीरो से भी बेहतर. उसकी देखा देखी उसके कुछ दोस्तों ने भी Colorful कवर लगानी शुरू कर दी थी अपनी पुस्तकों पर. लेकिन वो कवर ख़ुद लगाते थे उनके पापा नहीं और फिर उनमे वो बात भी नहीं होती थी जो सुकृत की पुस्तकों में होती थी.

फिर उसके पास मार्बल पेन्सिल थी जो पापा ने ला कर दिया था - वो भी Colorful - Orange, Yellow, Green कलर की. उसके पीछे Eraser भी लगा था. कितना ध्यान रखते थे वो उसका. सुकृत भी पापा से चिपके बिना सो नहीं पाता था. उसे लगता की एक दिन वो भी पापा की तरह ही सुपर हीरो बनेगा. सबका ख्याल रखने वाला. हर चीज को अलग ढंग से करने वाला.

आज भी याद है उसे जब पापा ने Secondhand Scooter ख़रीदा था. Bajaj का Scooter. हालाँकि तब तक उसके कुछ दोस्तों के पिता ने भी Scooter खरीद लिया था लेकिन उसके पापा का Scooter सबसे Best था.
वो एक समय था जब पापा की हर बात अलग लगती थी, निराली लगती थी. और आज वो समय है जब लगता है की व्यर्थ ही पापा को सुपर हीरो समझते रहे थे. पापा सुपर हीरो बिलकुल नहीं हैं. वो एक आम इंसान हैं. सड़क पे चलते किसी भी इंसान की तरह. पापा की साइकिल पे तेजी से चलते समय पीछे जाते किसी भी इंसान की तरह... जिसका वज़ूद उतनी ही देर तक रहता है जितनी देर तक नज़र उस पर टिकी रहती है. मेरे पापा सच में एक Ordinary Man हैं. कोई सुपर हीरो नहीं हैं. बेकार ही उन्हें इतना Importance देता रहा था मैं.

पता नहीं ऐसी कितनी बातें सुकृत के दिमाग में चल रही थी. वो अपनी काले पीले रंग वाली Street Cat Cycle पे पैंडल मारता हुआ तेजी से घर की तरफ जा रहा था.
Street Cat Cycle भी तो पापा ने ही खरीद कर दी थी ना उसे. जब ये साइकिल घर आयी थी तो जैसे वो सातवें आसमान पे था. कितने शान से पापा ने कहा था - "अब तुम हाई स्कूल में आ गए हो, तो अब इस साइकिल से स्कूल जाना."
सुकृत तो अचानक ही अपने स्कूल में सबसे अलग लोगों में शामिल हो गया था. कुछ ही बच्चे थे स्कूल में जिनके पास सीधी हैंडल वाली साइकिल थी और उनमे से भी दो - एक लड़कों के पास Street Cat Cycle. उन दो - एक लड़कों में वो एक हो गया था. रोज वो सुबह सुबह अपनी साइकिल को ग्रीस से चमकाता था. और स्कूल जाने से पहले भी एक बार साफ़ करता था. हालाँकि उसे उस वक़्त ये समझ में नहीं आया की घर में साइकिल

आते ही पापा का स्कूटर क्यों घर से बाहर नहीं निकलने लगा था. क्यों स्कूटर की थोड़ी सी Servicing का काम पापा टाल रहे थे? क्यों पापा अब ऑफिस आधा घंटा पहले निकलने लगे थे. असल में वो अब कोई सुपर हीरो नहीं थे, शायद इसलिए.

क्या माँगा था उसने पापा से - एक पारकर पेन ही ना. कौन सी दौलत मांग ली थी उसने पापा से. सौ रुपये की भी नहीं थी वो पेन. सिर्फ 99 रुपये की थी. पिछले एक महीने से टाल रहे थे - अच्छा कल ले आऊंगा, परसों मैं पैसे देता हूँ तुम खुद खरीद लेना.

पापा जितना ध्यान पहले रखते थे मेरा अब नहीं रखते. पारकर पेन तो सिर्फ एक चीज है. ऐसी छोटी छोटी कई चीजों को पापा टालने लगे थे. पिछली दफा जब मैंने Super Commando Dhruv और नागराज के Comics Digest की बात की थी तो भी वो टाल गए थे. अब मेरे पापा सुपर हीरो नहीं रहे थे. वो सुपर जीरो हो गए हैं.

यही सोचता सोचता कब वो अपने पापा के ऑफिस के सामने से निकल गया पता ही नहीं चला. सुकृत को पापा की ऑफिस से घर का एक शार्ट कट रास्ता पता था. सोचा चलो उस रास्ते से घर चला जाता हूँ. ऐसे तो 8 KM का रास्ता है, इधर से निकला तो लगभग 6 KM में ही पहुँच जाऊंगा. यही सोचते सोचते उसने उस रास्ते पर अपनी साइकिल घुमा ली. साइकिल अपनी रफ़्तार में चल रही थी. उसके खयाल भी उसी रफ़्तार में चल रहे थे. हर वो उदाहरण जो पापा को सुपर हीरो से सुपर जीरो साबित करे उसके दिमाग में Slides की तरह चल रहे थे. जितना ही वो सोचता उतना ही उसका विश्वास अपने पापा से उठता जाता. तभी उसे दूर एक पहचानी सी आकृति आगे जाती दिखाई दी. अरे, ये तो पापा हैं शायद. पापा ही हैं. ये पैदल कहा जा रहे हैं. अचानक सुकृत की पैरों की रफ़्तार पैंडल पे धीमी हो गयी, और साइकिल भी. वो जानना छटा था की पापा पैदल कहाँ जा रहे हैं. वो छुपता छुपाता धीरे धीरे साइकिल चलाता पापा का पीछा करने लगा. पापा घर की ओर जा रहे हैं. वो सन्न रह गया. पापा ऑफिस से घर पैदल जा रहे हैं. तो क्या पापा रोज़ ऑफिस पैदल आने जाने लगे हैं? तभी वो ऑफिस के लिए थोड़ा पहले निकलते हैं इन दिनों. रोज 6 KM सुबह, 6 KM शाम को पैदल चल रहे हैं. किसलिए, की रोज ऑटो का 14 - 15 रुपये बचा पाएं. अब तो सुकृत को काटो तो खून नहीं. पता नहीं किन परेशानियों से गुजर रहे हैं पापा. एक बार मन किया की पीछे से पापा के पास पहुँच कर बोले की पापा आ जाओ, आप मेरी साइकिल की कैरियर पे बैठ जाओ, आज मैं आपको शहर की सैर करा लाऊँ. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी पापा तक जाने की. उसने घर के पास के दूसरे रास्ते से तेजी से साइकिल निकाल ली. शायद इतनी रफ़्तार से सुकृत ने कभी साइकिल नहीं चलाई थी. आँखों से झर झर आंसू बहे जा रहे थे. लगा की सारी फसाद की जड़ वही है. समझ नहीं पा रहा था क्या करे की पापा को कोई तकलीफ ना हो. उन्हें ऐसा करने पर मज़बूर ना होना पड़े. लेकिन ये परिस्थितियां भी तो उसने ही पैदा की है. उसकी मांगें इतनी बढ़ गयी है इन दिनों की पापा को एक - एक पैसा जोड़ने के लिए आज इतना पैदल चलना पड़ रहा है. स्कूटर नहीं बनवा पा रहे हैं.

अपने आंसुओं के समुन्दर में डूबता उतरता सोचता संभलता आखिर घर पहुँच हीं गया, पापा से पहले. साइकिल लगाया और दौड़ते हुए छत पे जाने लगा. माँ ने आवाज़ भी लगाई, पर अनसुना कर भागा वो. छत पे जा कर वो फूट फूट के रोने लगा. नहीं मेरे पापा आज भी सुपर हीरो हैं. और हमेशा रहेंगे. सुपर जीरो तो मैं हूँ. कितना कष्ट दिया है मैंने पापा को और पापा ने कभी उसे अभिव्यक्त नहीं किया, कभी उसे जानने भी नहीं दिया की वो कैसे दौर से गुजर रहे हैं. आज अचानक ही उसे लगने लगा की वो बड़ा हो गया है, सचमुच का. आज वो असल में हाई स्कूल का स्टूडेंट हो गया था. अब वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो उसके पापा को ख़ुशी दे, सच्ची वाली ख़ुशी.
तभी माँ की आवाज़ आई - "सुकृत नीचे आ जा बेटा, पापा बुला रहे हैं तुझे. देख तेरे लिए क्या ले कर आये हैं."
जैसे तैसे अपनी सिसकियों पे काबू पा कर सुकृत ने अपना चेहरा धोया और भारी क़दमों से नीचे आ गया.
पापा ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे. उनके हाथ में एक लिफाफा था. वो उसे सुकृत की और बढ़ाते हुए बोले - "देख सुकृत, कलर तो पसंद है ना तुझे. नहीं तो मैं Return करवा कर तुम्हारी पसंद वाली रंग की ले आऊंगा."
कांपते हाथों से उसने लिफाफा ले कर खोला. एक खुबसूरत प्लास्टिक बॉक्स में नीले रंग का पारकर पेन था. 99 रुपये वाला नहीं, 199 रुपये वाला. पारकर पेन देखते ही न जाने कहाँ से उसकी आँखों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी. वो कस के पापा से लिपट गया. लगातार रोये जा रहा था. पापा उसके सर पे हाथ रखे उसके बाल सहला रहे थे.

"প্রথম বর্ষাতি"

পায়েল চক্রবর্তী

লাল,হলুদ,নীল,সবুজ ঠিক লুডোর ছকের চারটি রঙের মেলবন্ধনে ছোট্ট পিয়ালীর ছোট্ট বহরের একটি ছাতা ছিল। ছাতাটি খুলবার জন্য তার যতটুকু ক্ষমতা সর্বস্ব প্রয়োগে টেনে উপর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েও ব্যর্থ হ'লে পরে সেই মা অথবা বাবার সাহায্য নিতেই হ'তো। বন্ধ করা আরও বিপদজনক ছিল ছোট্ট পিন কে আঙ্গুল দিয়ে সজোরে চেপে ধরলেই ছাতা হুসস করে চুপসে যেত। ছাতাটি নিজেই বন্ধ করবে ভেবে একদিন চেষ্টা করতে গিয়ে হাতে খুব জোর ব্যথা পেয়েছিল; কালসিটে দাগ আঙ্গুলে রক্ত জমাট বেঁধে। কিন্তু সে দেখেছে ঐ অমুক দিদির ছাতাটা দিব্যি সুইচ টিপে খুলে যায় এত কসরত করতে হয়না তো! তাহলে তার ছাতা টা এত বেয়াড়া কেন! অভিযোগ করেও ছিল মা কে কিন্তু লাভ হয়নি মা বকে দিয়েছিল। মা বলেছিল নিজেরটা নিয়েই খুশি থাকতে শেখ...অগত্যা!! কিন্তু মুশকিলটা হ'লো চাইলেও নিজের ছাতা নিজে খুলতে আর বন্ধ করতে সে পারতো না। বর্ষার দিনে প্রাইমারী স্কুল থেকে হাঁটাপথে ফিরতি সময় বৃষ্টি হলে ছাতা খুলতে গিয়ে বন্ধুদের সাহায্য নিতে হ'তো প্রথম প্রথম, পরে অবশ্য খোলাটা কষ্টেসৃষ্টে পেরে গেলেও বন্ধ করতে না পেরে বৃষ্টি কমে যাওয়া সত্বেও খোলা ছাতা মাথার উপর নিয়েই বাড়ি অবধি এসে দরজায় মা কে ডাক দিতো শিগগিরি এসোনা গো ছাতাটা বন্ধ হচ্ছে না যে! স্কুলে যাওয়ার পথে বৃষ্টি হলে পরে সে স্কুলে গিয়ে খোলা ছাতা কে ক্লাসরুমের এককোণে মেলে রাখতো। ছাতার জ্বালাতন সহ্য করতে হ'তো ঠিকই.... তবু ছাতাটি খুব প্রিয় ছিল তার, হবেই না বা কেন মাথার উপর গোল গোল পাকে ঘোরাতে ঘোরাতে পথ চলতে মনের এলো মেলো পাহাড় বেয়ে খুশির ঝর্ণা নেমে আসতো যে! সহ্য, অসহ্য, না পারার অনেক উর্ধ্বে ছিল এই খুশিটুকু...।

চিরস্থায়ী কোনোকিছুই নয়, আসা-যাওয়া নিয়েই এই জগৎ সংসার। রঙীন ছাতাটিও একদিন পুরনো হয়ে ভেঙ্গে গেলো ঝড়ের উজানে। নতুন এক ছাতা কিনে আনলো বাবা। খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিল সেদিন সে নতুন অতিথিকে কখন দেখবে। যখন এলো সেই নতুন অতিথি ছুট্টে গিয়ে বাবার ব্যাগ থেকে বের করে আনলো, তারপর তক্তপোসে বসে দেখলো নতুন এক ছাতা

প্রিন্টেড হলুদ রঙের... হাতি, ঘোড়া আরোও কতরকম বক্স বক্স রাউন্ড রাউন্ড নক্সা ছিলো নতুন ছাতায় ঠিক যেন এক রূপকথার দেশ। পুরনোর সাথে নতুনের এই এক টানাপোড়েন কোনটা বেশি ভালো...!! তবু পুরনো কে পিছনে রেখেই নতুন কে সঙ্গে করে চলতে হয় এটাই নিয়ম বিশ্ব ভুবনে। সে না হয় ঠিক আছে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পিয়ালী পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলো, হাইস্কুল, তাও এক কিলোমিটার পথ হেঁটে যাওয়া দুস্কর রোজ রোজ। তাই অগত্যা বাবার অতি পরিশ্রম শেখালো সাইকেল চালাতে। সাইকেল এ তখনো পোক্ত নয় এদিকে বর্ষাকাল এসে গেছে। একহাতে ছাতা খুলে মাথা বাঁচাবে নাকি কর্দমাক্ত গর্ত থেকে সাইকেলের চাকা ব্যালেন্স করে চলবে... উভয়সংকট। সমস্যার সমাধান করতে বাবা নিয়ে এলো বর্ষাতি... রেইনকোট। আহা সে যে কী আনন্দের মুহূর্ত দুগ্গা পুজোর নতুন জামার থেকে কম কিছু না। তক্ষনি পরে আয়নার সামনে নিজেকে কেমন লাগে দেখতে লাগলো। হাঁটুর নিচ অবধি লম্বা, ফুল স্লিভ, লাইট সি গ্রিন কালারের ওপর ফুলের লতানো নক্সা, মাথা ঢাকার একখানি টুপিও যোগ করা ওটা পরে কোই মিল গ্যায়ার জাদুর মতো এলিয়েন এলিয়েন ফিলিং হলো বেশ। তারপর থেকে স্কুল ব্যাগ এ রেইনকোটকে যত্ন করে পাট করা অবস্থায় রেখে দিত মা। বৃষ্টি হলেও নো চিন্তা। রেইনকোট হ্যায় না ... ।

জীবনের সফরে এমন নানা আশ্রয় তথা ছত্রছায়ার আনা-গোনা চলতেই থাকে আবার হারিয়েও যায়....। বর্তমানে ফোল্ডিং ছাতা বেশ ব্যবহারযোগ্য। তারপর আবার নামী দামী ব্র্যান্ড এর ব্যপার ও আছে। এতকিছু সহজলভ্য ও আরামদায়ক আধুনিকতার মধ্যে মাঝে ছোটবেলা ডেকে যায় মনের কাছাকাছি। সেই প্রথম ছাতা, প্রথম রেইন কোর্ট গুটিগুটি এসে পর পর লাইন এঁকে একটা আস্ত ফেলে আসার গল্প লিখে যায়। কিছুটা মন কেমন আর অনেকখানি ভালোলাগার আবেশ নিয়ে বর্তমান অবসর সময়টুকু একনিমেষে তরতাজা হয়ে ওঠে। আর এভাবেই একটা অভিমানী বিকেল ফুরিয়ে আসে সাঁঝের পিদিম জ্বেলে, শঙ্খনাদে---------